দৈনিক সংবাদ

# শিক্ষাই চেতনার মূল উৎস

আবদুল খালেক
(প্রাক্তন আইজি পুলিশ)

180

...ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করে আদি মানুষ বর্তমান যুগে পৌঁছেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার মৌল উৎস হিসেবে, শিক্ষাকে ইউরোপে যে দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন আমাদের বর্তমান শিক্ষানীতি ও ধ্যান-ধারণার মূল্যায়নে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

খৃষ্টপূর্ব পাঁচ থেকে চার হাজার বছর আগের চীন দেশের সান্সি প্রদেশে লিখিত ভাষার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর নাগাদ ইরাকের নগরবাসীরা তাদের পণ্য বেচাকেনার হিসেব রাখার প্রয়োজনে লেখা-পড়ার গুরুত্ব অনুভব করে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নিজেদের বাড়ীঘরে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। গ্রামগঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে ধর্ম প্রচারের সুবিধার্থে ধর্মযাজকরা প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইহুদীরা যখন ব্যাবিলনিয়ায় আটকা পড়ে, তখন তাদের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ধর্মশালাগুলোতে সন্তানদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল প্রয়োজনীয় সতর্কতার সহিত। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে এথেন্সবাসী গ্রীক নাগরিকরা আইন শিক্ষায় বিশেষ মনোযোগী হয়ে ওঠে। কেননা, সেসময় পেশাদার আইনজীবী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেনি এবং নাগরিকদেরকে নিজেদের মামলা মোকদ্দমা বিচারালয়ে পরিচালনা করতে হতো। গ্রীকদের ব্যবহৃত বর্ণমালার নিজ নিজ সুস্পষ্ট ধ্বনি এবং সরল আকৃতির জন্যে লেখাপড়া শেখা সহজ হয়ে ওঠে। ফলে, অতি অল্প সময়ে গ্রীকরা আইন, দর্শন, কবিতা ও সংগীতে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

রোমের নাগরিক জীবনে আইনের গুরুত্ব খুব বেশী ছিল বলে ছেলেবেলাতেই অভিজাত শ্রেণীকে আইনের মৌল বিষয়গুলো শেখাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। রোমান সম্রাটরা যুবরাজদেরকে সাম্রাজ্য শাসনের ও সংরক্ষণের যোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে প্রশাসন বিষয়ক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে। বিশাল রোমান জগতে লেখাপড়া সাধারণতঃ উচ্চ ও মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ধর্ম ছিল শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু। সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার গ্রামার স্কুল স্থাপন করে সেখানে শাসক, সরকারী আমলা, ব্যবসায়ী ও সামরিক কর্মকর্তাদের সন্তানদের উচ্চ মানের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

এক কথায় বলতে গেলে, মধ্যযুগের ইউরোপে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল মুখ্যতঃ ধর্মযাজকদের কবলে। পুরোহিতবিদ্যা, প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম ইত্যাদি ছিল শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু। মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বার্গারদের সন্তানদের জন্যে সাধারণ শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। স্মরণ করা যেতে পারে যে, বালিকাদের শিক্ষাকে মোটেও গুরুত্ব দেয়া হতো না। শুধুমাত্র মিশনারী কাজে যেতে ইচ্ছুক বালিকাদেরকে ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো। অন্য বালিকারা একটুকু-আধটুক সেলাই, বুনন ইত্যাদি শিখে নিতো এই ভেবে যেন স্বামীর ঘরে কেউ গালি দিতে না পারতো যে, মেয়েটি একেবারে জঙ্গল থেকে এসেছে। ছেলেরা সাধারণতঃ তরবারি, বর্শা ও অশ্ব চালনায় উৎসাহী ছিল। কেননা (Knight) হবার তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। ইতিহাস বিখ্যাত বিজয়ী উইলিয়্যাম, অটো দা গ্রেট এবং রাজা শারলেমেন লিখতে জানতো না।

১১৫৫ সালে ফরাসী মিশনারীদের গিল্ড অর্থাৎ ইউনিভারসিটাস প্যারিসে একটি উচ্চ শিক্ষালয় স্থাপন করে এবং নটারডাম চার্চের অনুমতিক্রমে শিক্ষাপ্রাপ্তদেরকে শিক্ষক হবার লাইসেন্স দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইউনিভারসিটি শব্দটি ইউনিভারসিটাস থেকে উদ্ভূত। ১১৬৩ সালে অক্সফোর্ড এবং ১২১৪ সালে ক্যাম্ব্রিজ ইউনিভারসিটি পাদ্রীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণ ও মধ্যবিত্তদের নাগালের বাইরে ছিল এসব ইউনিভারসিটি। শিক্ষার বিষয়বস্তু ছিল মুখ্যতঃ ধর্ম, প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি। ফরাসী ও ইউরোপের অন্য অভিজাতরা সে-যুগে বিজ্ঞানকে নিম্নবিত্তের লোকদের শিক্ষার বিষয়বস্তু বলে মনে করতো। রাজা, চার্চ এবং বড় ভূ-স্বামীরাই শিক্ষালয় পরিচালনা করতো।

রেনেসাঁর যুগে যুক্তি ও মুক্তচিন্তার প্রভাবে ইউরোপে রাজা, চার্চ ও ভূ-স্বামীদের সঙ্গে স্বৈরশাসক ও অভিজাতদের দাপট কমতে শুরু করে। কালের প্রবাহে নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখার দ্বন্দ্বে তারা শিক্ষার দিকে মনোযোগী হতে শুরু করে। এদিকে সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদিতে সাধারণ মানুষেরও গরীব-দুঃখীর জীবনের চিত্র ফুটে ওঠতে থাকে। শিক্ষালয়ে মুক্তচিন্তা ও যুক্তির গভীর ছোঁয়াচ লাগার ফলে ইউরোপ নতুনভাবে আলোকিত হয়ে ওঠে। মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারায় যুক্তির আকাঙ্ক্ষা বিকশিত হয় এবং অধিকারের চেতনায় সমাজে অস্থিরতা দেখা দেয়। তাতে স্বৈর শাসকদের ভিত নড়বড়ে হয়ে ওঠে। ফলে, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মাধ্যমে সেই অস্থিরতা দমনের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

প্রণিধানযোগ্য যে, শিল্প বিপ্লবের আগে এবং অব্যবহিত পরেও সাধারণ কৃষক ও শ্রমিকদের জীবনে শিক্ষার আলো ফুটে ওঠুক এবং অধিকারের চেতনা সৃষ্টি হোক--এটা শাসক মহল মেনে নিতে চায়নি। ছোট কৃষকদের সন্তানদের মাঠের কাজে যোগ দিতে হতো বলে স্কুলে যাবার সুযোগ হতো না। শীতকালে মাঠে কাজ না থাকলেও তাদেরকে স্কুলে পাঠানো হতো না এই ভয়ে যে, প্রয়োজনীয় শীতকালীন বস্ত্রাদির অভাবে স্কুলে আসতে-যেতে ঠাণ্ডায় তাদের স্বাস্থ্যের হানি ঘটতে পারে। বড় বড় কৃষক হিসেব-নিকাশের প্রয়োজনে সন্তানদেরকে হিসেব-বিদ্যা শেখাতো।

১৮০৭ সালে ইংল্যাণ্ডের এক রয়েল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট শ্রমিকদেরকে লেখাপড়া শেখাবার লক্ষ্যে উপস্থাপিত এক প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে মন্তব্য করেছিল যে, লেখাপড়া শিখে শ্রমিকরা তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠবে এবং ফলে, শিল্প মালিকরা বে-কায়দায় পড়বে। প্রসংগতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ওমানের সুলতান একবার মন্তব্য করেছিল যে, ভারতবাসীকে লেখাপড়া শেখাবার ফলে বৃটেনকে ভারতবর্ষ হারাতে হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনিশ মিশনারীরা মনে করতো যে, মেক্সিকোর উপজাতীয়দেরকে লেখাপড়া শেখালে সেখানে রাজনৈতিক বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করা হবে। কাজেই তাদেরকে অশিক্ষিত রাখাই হবে বাঞ্ছনীয়। ১৮৫০ সালে মাদ্রিদে একটি স্কুল স্থাপনের প্রস্তাবে অনুমতি না দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী মন্তব্য করেছিল--এখানে আমরা চিন্তাশীল লোক চাইনা, আমরা চাই কাজ করার বলদ।

একমাত্র জার্মানীতেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে সরকারী শিক্ষানীতি চালু করা হয়। প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট এক ফরমানে ঘোষণা করেছিল যে, পাঁচ থেকে তেরো বছরের সকলকে দিনে ছয় ঘন্টা স্কুলে পড়াশুনা করতে হবে। কিছুকাল আগে থেকেই অবশ্যি জার্মানীতে শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছিল। কৃষকদের অধিকাংশই পড়তে জানতো। অভিজাতরাও উচ্চশিক্ষায় ইউরোপের শীর্ষে ছিল।

আগেই বলেছি যে, রেনেসাঁর যুগে মুক্তচিন্তা ও যুক্তির প্রভাবে ইউরোপের মন-মানসিকতায় অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এই আলোড়নের ঢেউয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ শাখা প্রশাখায় জ্ঞানার্জনের চেতনা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শিক্ষাকে শিল্পোন্নয়নের অপরিহার্য সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ধর্মের গোঁড়ামি দুর্বল হয়ে পড়ে। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার যথোচিত কাঠামোতে ফেলে ধর্ম শিক্ষাকে উন্নত যুক্তির ধারায় প্রবাহিত করবার প্রচেষ্টা চালানো হয়। বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও উদার শিল্পের দিকে নিক্ষিপ্ত হয় শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি। গবেষণা-প্রসূত জ্ঞান ও তার বাস্তব প্রয়োগ ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব পেতে থাকে। সমাজে উচ্চশিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়া এখনো চলেছে।

১৮৭০ সালে ইংল্যাণ্ড সার্বজনীন প্রাইমারী শিক্ষানীতি গ্রহণ করে। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশেও অনুরূপ নীতি প্রায় একই সময়ে গৃহীত হয়। ব্যয়বহুল পাবলিক স্কুলগুলোতে বিশেষ বিবেচনায় সরকারী সাহায্য দেয়া হতো। আজো এইসব স্কুলে দেশের শতকরা ১০-১৫ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। ব্যয়বহুল উচ্চমানের পাবলিক স্কুলে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীরা আর্থিক কারণে যেতে পারছে না। সত্তরের দশকের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে...

দৈনিক সংবাদ

বৃটিশ জেনারেলদের শতকরা ৮৭ জন, বিশপদের শতকরা ৮৩ জন, বিচারকদের শতকরা ৮৫ জন, ফরেন সার্ভিসের শতকরা ৯৫ জন এবং পদস্থ সিভিল সার্ভিসের শতকরা ৬৭ জন ব্যয়বহুল পাবলিক স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। শ্রমিক, কর্মচারী ও অন্যান্য নিম্নবিত্তের সন্তানরা জীবনযুদ্ধে পাবলিক স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্তদের সংগে পেরে ওঠছে না, কেননা তারা বড়জোর দ্বিতীয় শ্রেণী মানের শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে।

বৃটিশ শাসন আমলে ভারতীয় ধনিক-বণিক এবং সামন্তবাদী অভিজাতদের সন্তানদেরকে বিলেতী পাবলিক স্কুলে লেখাপড়া শেখাবার প্রবৃত্তি দেখা গেছে। আমাদের নব্য ধণিক-বণিকরা এবং সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনে অবস্থিত তাদের সহচরদের এখন অনুরূপ প্রবৃত্তি দেখা যাচ্ছে। তাদের কেউ কেউ বিলেতে আবাসিক অবস্থান নিয়ে সন্তানদের লেখাপড়ার তদারকিও করছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং পরবর্তীতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা বিলেতী শিক্ষিত ছিল তাদের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে আপোষকামিতা অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে।

১৭৮০ সালের পূর্বে ভারতবর্ষে শিক্ষাকে সরকারের দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। একই সালে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা মাদ্রাসা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রশাসনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটা রাজনৈতিক চাল হিসেবে। তারপর ঔপনিবেশিক প্রশাসনের প্রয়োজনে যথোচিত পাঠক্রমভিত্তিক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। উল্লেখ্য যে, ধর্মভিত্তিক স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ও ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খৃষ্টধর্ম প্রচারের সুবিধার্থে মিশনারীরা উপজাতীয় অঞ্চলে, শহরে এবং নিম্নবর্ণের হিন্দু এলাকায় খৃষ্টীয় আর্থ-সামাজিক প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। ১৭৮০ সালের পূর্বে বেসরকারী গুরুগৃহ, মক্তব, মাদ্রাসা, টোল ইত্যাদি ছিল ভারতবাসীর শিক্ষালয়। এখন বাংলাদেশে একপ্রকার নব্য-গুরুগৃহ (যেমন টিউটরিয়্যাল হোম, কিণ্ডারগার্টেন ইত্যাদি) জাঁকজমকের সাথে গড়ে ওঠেছে শহরাঞ্চলে। মধ্যবিত্ত অথবা নিম্নবিত্তদের আয়ত্তের বাইরে এ-সব প্রতিষ্ঠান। প্রাইমারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত মানের মৌলবাদী ইসলামী শিক্ষালয় সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য-সহায়তায় লক্ষণীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাম্প্রতিককালে। ব্যয়বহুল ক্যাডেট কলেজ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল-কলেজে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের প্রবেশের পথ রুদ্ধ। সরকারী স্কুল-কলেজও শহরে এবং উপশহরে সীমাবদ্ধ। হাজারো সমস্যায় জর্জরিত গ্রামীণ সরকারী-বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল, সেকেণ্ডারী স্কুল ও কলেজে নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীনদের ছেলেমেয়েরা যথাসম্ভব শিক্ষালাভ করে। শিক্ষালয়ে বিরাজমান নৈরাজ্য, শিক্ষা প্রশাসনের দুর্নীতি, অযোগ্যতা, পরীক্ষায় নকলবাজি এবং সহিংসতা বাংলাদেশকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অনেকখানি। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আচার্য এবং প্রাইমারী, মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজ শিক্ষক সমিতিসমূহের ফেডারেশনের সভাপতি মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন নিবেদন জানিয়েছেন সুধীজন। কিন্তু ফলাফলের জন্যে এস,এস,সি পরীক্ষা সম্পর্কিত প্রকাশিত খবরের দিকে তাকালেই চলবে। কিছুকাল আগে ছাত্ররা জোরগলায় বলতে শুরু করেছিল,--দেশে নির্বাচন হয় যেভাবে, আমরাও পরীক্ষা দেব সেভাবে। দেশের প্রায় সবকটি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থী, পরিদর্শক, অভিভাবক এবং তাদের সাহায্যকারী ও আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সংগে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ এবার বেশ জমে ওঠেছে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা আজকাল হাসপাতালে স্থান পাচ্ছে না নির্বাচন, পরীক্ষাকেন্দ্র ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে আহতদের জন্যে। জেল প্রশাসন ভেঙ্গে পড়েছে রাজনৈতিক কারাবন্দীদের অভূতপূর্ব সংখ্যাধিক্যের চাপে। আমাদের দুর্নীতি, নির্বাচনী প্রহসন, মিথ্যাচার ইত্যাদির জন্যে আমাদের দিকে তাকিয়ে কেউ কোন শুভ-শিক্ষার প্রেরণা পাবে এরূপ আশা করা যায় না।

মধ্যযুগীয় ইউরোপের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা এখনো চলছি। মুক্ত চিন্তা ও যুক্তির দিকে যখনই এগিয়ে যেতে চেষ্টা করেছি তখনই আমাদের ওপর নেমে এসেছে স্বৈর শাসনের দাপট ও নির্যাতন। পরিলক্ষিত হয়েছে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার সরকারী দায়িত্ব পালনে গড়িমসি ও ধানাই-পানাই। পক্ষান্তরে শিক্ষাকে বিপরীতমুখী বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করে সামগ্রিকভাবে দেশে সম্ভাব্য সুসংহত ঐক্যবদ্ধ চেতনা সৃষ্টির মূলে আঘাত হানার লক্ষ্যে পাঁয়তারা চলছে। দেশের বৃহৎ গণগোষ্ঠী এখন ভীতসন্ত্রস্ত, দিশেহারা, অসহায় এবং ক্ষুব্ধ অথচ নীরব। অর্থনৈতিক উন্নতির অসার তর্জন-গর্জন, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে প্রতিক্রিয়াশীলতার তৎপরতা সৃষ্টির নীতি এবং পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে অপব্যবহারের প্রচেষ্টা দেশকে ত্রিমুখী অথবা বহুমুখী সংঘাতের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে। এককালে এইরূপ সংঘাতের ফলে ইউরোপে বহু মর্মান্তিক রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছে। এবং ঐ-সব ঘটনার প্রবাহে শ্রেণী-দ্বন্দ্বও কম ঘটেনি। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, দারিদ্র্যের লৌহকপাট ভেঙ্গে বেরুবার এ চেতনা সুসংগঠিত না হলেও বাংলাদেশের বিশাল অশিক্ষিত গণ-মানুষের মধ্যে কিছুটা তো জেগেছে। প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার থেকে বঞ্চিত বাঙালীর মতিগতি কোনদিকে মোড় নিতে পারে, সেটাও ভাববার বিষয় বটে।

দেশে বিরাজমান পরিস্থিতিতে দেশবাসীকে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত রেখে এগিয়ে যাবার পথ রুদ্ধ বলে মনে করি। বিগত চারদশকে আমাদের শিক্ষিতের হারে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়নি। এখনো আমরা শতকরা [illegible]শের কোঠায় আবদ্ধ রয়েছি। এবং তা-ও নাম-সই-এর শিক্ষা মানদণ্ডের হিসেবে। এদিকে মহিলাদের মধ্যে শিক্ষিতের হার পুরুষের মাত্র অর্ধেক। আমাদেরকে সরকারীভাবে বলা হচ্ছে যে, দুই হাজার সাল নাগাদ বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে। জানি না, অতীতের মতো এই আশ্বাস শেষ পর্যন্ত আশ্বাসই থেকে যাবে কিনা। ইচ্ছে করলে, এই বছর থেকে বাধ্যতামূলক শিক্ষানীতি গ্রহণ করা যেতে পারে বৈকি। কিন্তু আমরা তা করছি না।

শেষ করার আগে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার শিক্ষা বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই। সেখানে ধনী-দরিদ্র, পুরুষ-নারী, সাদা-কালো, কর্মকর্তা-কর্মচারী, শ্রমিক কৃষক,---সবাই সার্বজনীন নি-খরচা শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ পাচ্ছে। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের আগে স্কুল বয়েসীদের মাত্র শতকরা ২০ জন স্কুলে যেতো এবং তাদের অধিকাংশ সামান্য প্রাইমারী শিক্ষা লাভ করতো। নয় থেকে পঞ্চাশ বছরের তাজিক, কিরগীজ ও তুর্কমানদের শিক্ষার হার ১৯১৭ সালের আগে ছিল যথাক্রমে শতকরা ২'৩, ৩'১ এবং ৭'৮ জন। ১৯৩০ সালে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষাআইন পাস করে আট বছরের উর্ধ্ব বয়সী সকল ছেলেমেয়েকে চার বছরের জন্যে স্কুলে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। ত্রিশের দশকের শেষের দিকে সাত বছরের এবং ১৯৫৯ সালে আট বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন পাস করা হয়। ১৯৭০ সালের শুমারিতে দেখা যায় যে, সমগ্র রাশিয়ায় শতকরা ৯৯'৪ জন পুরুষ, এবং ৯৯'৭ জন মহিলা শিক্ষিত হয়ে ওঠেছে এবং আট বছরের শিক্ষাপ্রাপ্তদের শতকরা ৮০ জন দশ বছরে স্কুলে গিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ব্যাপক প্রাণহানি এবং ১৯১৭ সাল থেকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক বিশ্বের অর্থনৈতিক অবরোধ থাকা সত্ত্বেও মাত্র পাঁচ দশকে বিশ্বের তৃতীয় জনবহুল রুশ দেশে এত শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞের উত্থান সম্ভব হয়েছে। আজকের বিশ্বে প্রকাশিত বইয়ের, শিক্ষারত ছাত্রের, গবেষণা কর্মীর এবং ডাক্তারের এক-চতুর্থাংশ রাশিয়ান নাগরিক। রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষায় শতকরা ৪৭ জন মহিলা এবং সেকেণ্ডারী পর্যায়ের শিক্ষায় তাদের সংখ্যা শতকরা ৫৪জন, চীন ও আরো কয়েকটি দেশেও রাশিয়ান গতিবেগে শিক্ষাকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা চলছে। সার্বজনীন কল্যাণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক, সাম্যবাদের বাণী মহান ইসলাম ধর্মেও নিহিত। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক শিক্ষা ও দীক্ষায় ইসলামকে বিকৃত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এক শ্রেণীর স্বার্থবাদীদের সক্রিয় উদ্যোগে। তবে আশার কথা,--এই প্রচেষ্টা প্রতিহত করার প্রয়োজনীয় চেতনা প্রবাহ সৃষ্টির কাজে ওঠে পড়ে লেগেছেন দেশবাসী যুক্তিবাদী সুধীজন ও চিন্তাবিদরা।

28 MAR 1988
114